বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ প্রসঙ্গ

আহমদ শরীফ

প্রতীচ্য শিক্ষার অবাধ বিস্তারে অনাগ্রহী হলেও ব্রিটিশ সরকার জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞানীকে শাসনের বিষয় ও পাত্র মনে করত না, তাই সেই ১৮৫৭ সনেই কোলকাতায়, মাদ্রাজে ও বোম্বাইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকালেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞানপীঠ হিসেবে অনেক বিষয়েই স্বাধীনতা এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিল না চাইতেই। অবশ্য সব ফরমূলারই করোলারি থাকে, সব নিয়মেরই থাকে ব্যতিক্রম, বিকল্পও থাকে, নিপাতনে সিদ্ধও থাকে, থাকে অশুদ্ধ হলেও আর্ষপ্রয়োগের স্বীকৃতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রতি সংঘটিত সিন্ডিকেটের রূপ ও প্রকৃতি দেখে ব্রিটিশ সরকারের বিদ্যার ও সংস্কৃতির মূল্য ও মর্যাদাবোধের কথা মনে পড়ে গেল। ১৯৭৩ সনের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে অনেক ভালো ও উন্নতমানের প্রশাসনিক ব্যবস্থা রয়েছে। তবে তখন আমাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ছিল না বলে এর মধ্যে কিছু ত্রুটিও থেকে গেছে। যেমন ইদানীং পূর্বে সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন পদ্ধতিতে ত্রুটি ছিল বলে, দু'চারজন মতলববাজ বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়দের রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সদস্য করে নিতেন অদৃশ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থে। এবং দলগতভাবে এক ঘরে বসেই ব্যালটপত্রে ভোট চিহ্ন বসানো যেত ও হত। এতে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের সংখ্যাগুরু দল সব বা প্রায় সব সদস্যপদ পেয়ে যেত। আর উপাচার্য নির্বাচনে মুখ্য ভূমিকা পালন করত। আবার রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সদস্য সংখ্যা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সদস্যের সংখ্যা বেশিই থাকে। দুর্নীতির মতো শোনালেও সত্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট কোটা থেকে নির্বাচন প্রার্থী হন এবং জয়ীও হন। শিক্ষক ৩৫ জন, আর রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ২৫ জন। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিষদও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলো থেকে পাঁচজন অধ্যক্ষ এবং দশজন অধ্যাপক ও প্রতিনিধিরূপে সিনেটে পাঠান। এভাবে কার্যত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিনিধিত্ব করেন পুরো পঞ্চাশজন শিক্ষক। সরকারী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এবং ছাত্র প্রতিনিধিসহ সিনেটের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ১০২ জন। সিনেট সভায় বাইরের মনোনীত সদস্যদের সবাই উপস্থিতও থাকেন না। সাধারণভাবে উপস্থিত সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০/৮৫ জন। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিই থাকেন পঞ্চাশজন। এটি কি যুক্তিগ্রাহ্য কিংবা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা! এর ফলেই উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত প্যানেল যোগ্যতাভিত্তিক না হয়ে দলভিত্তিকই হয়। উপাচার্য পদে আসীন ব্যক্তিও তাই দলীয় আনুগত্য পরিহার করে নিরপেক্ষভাবে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে প্রশাসন চালাতে পারেন না। দলানুগত্যবশে পক্ষপাতিত্ব করতেই হয়। তাছাড়া উপাচার্য পদ একজন কেবল একবারই অলংকৃত করতে পারবেন এমন বিধি থাকলেও হয়তো কোন কোন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সৎ ও ন্যায়বান উপাচার্য নিরপেক্ষ প্রশাসন প্রবণ হতেন। কিন্তু সে ব্যবস্থাও নেই। উপাচার্যরা দ্বিতীয়বারেও নিয়োগ পাবার প্রত্যাশায় থাকেন, সুকৃতি-সুকীর্তির সুনাম সঞ্চয়ের বলে নয়, দলীয় শক্তির জোরে। আর পক্ষপাতিত্ব মানেই হচ্ছে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, জুলুম বিধি-নিষেধের অপপ্রয়োগ, নিয়ম-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, রীতি-রেওয়াজ লংঘন। এতে মজলুম পক্ষের ক্ষোভ-ক্রোধ-জ্বালা বাড়ে, আর জালেমপক্ষও হয় ক্ষমতায় প্রভাবে প্রতিপত্তিতে দর্পে দাপটে প্রতাপে প্রবল ও বেপরওয়া। ফলে অন্যায়-অবিচার-জুলুম প্রভৃতি প্রশাসনিক বিকৃতি ও দুর্নীতি বাড়তেই থাকে। এ অবস্থার সুযোগে সরকার প্রবল পক্ষের আনুগত্য কেবল দাবি করেই ক্ষান্ত হয় আদায়ই করে। একপক্ষ প্রতিকারকামী হয়েই আনুগত্য মাধ্যমে সরকারী আশ্রয় ও প্রশ্রয় কামনা করে। তাদের দুর্বল ও অসহায় পক্ষ জেনেই সরকার তাদেরও হাতে রাখে, আশা-আশ্বাস-ভরসা দিয়ে তাদের শান্ত ও অনুগত রাখে। যথাপ্রয়োজনে, যথাকালে যথাস্থানে কাজে লাগায় তাদের। কিন্তু প্রবল পক্ষেই থাকে সরকার, প্রবল পক্ষকে কব্জায় রাখার আবশ্যিক প্রশাসনিক গরজে। এভাবে শিক্ষকদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে রাজনীতিক দলের সঙ্গে। বিদ্যালয়েও ঢোকে দলাদলি। পরিবেশ হয় বিকৃত ও বিষাক্ত। শিক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় সুষ্ঠু পরিবেশ হয় বিনষ্ট। শিক্ষক-শিক্ষার্থীও জড়িয়ে পড়ে পালাক্রমে। তাই সম্প্রতি সংঘটিত সিন্ডিকেটে এনামে সেনামে নীতি-নিয়মের আক্ষরিক ফাঁকে ফুকরে দেশের শিক্ষাবিদরূপে, শিক্ষায় উৎসাহদাতা ব্যক্তিরূপে এবং চ্যান্সেলারের মনোনীত সদস্যরূপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই পেয়েছেন অধিক মনোনয়ন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তৃত্বের সংস্থা সিন্ডিকেটের মোট সতেরোজনের মধ্যে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, প্রফেসর, ডীন, প্রভোস্ট, সহযোগী প্রফেসর, সহকারী প্রফেসর, প্রভাষক-এ আটজন সদস্য থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো তিন-চারজন শিক্ষক ভিন্ন-ভিন্ন পথে ও পদ্ধতিতে সিন্ডিকেটে ঢুকে পড়েন, ফলে সতেরোজনের মধ্যে এগারো-বারোজনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের লোকই সদস্য থাকেন, নিয়ন্ত্রণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি-নিয়ম ও পরিচালনা সম্পৃক্ত সবকিছু। এ অবস্থায় ও অবস্থানে তারা কি নিজেদের লাভ-লোভ-স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন থেকে নিরপেক্ষভাবে গণস্বার্থে কাজ করতে পারেন? মানুষের ব্যক্তিক বা দলীয় সততা সদ্বুদ্ধি না থাকলে জনকল্যাণকর আদর্শে উদ্দেশ্যে লক্ষ্যে নিষ্ঠা রাখা সম্ভব হয় না, লাভে-লোভে-স্বার্থে মানুষ আইনের মোটা আবরণে ও স্থূল আনুগত্যে দুর্নীতিপরায়ণ হয়। বাহ্যত নীতি-নিয়ম বা আইন-কানুন ভঙ্গ হয় না বটে, কিন্তু তাতে কর্তার ও দলের অন্তরের পাপ তথা অপকর্মের অপরাধ ঢাকা পড়ে না। কেবল 'ঘটনা সত্য, তবে প্রমাণ নেই'-এ ফাঁকে কি আত্মসম্মান লম্বিৎসম্পন্ন বিবেকবান মানুষ সমাজে মাথা উঁচু করে চলতে পারে? আমাদের ব্যক্তিক, আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক রাষ্ট্রিক সর্বপ্রকার দুর্দশার মূলে মুখ্য কারণ হচ্ছে আত্মসম্মানবোধের, বিবেকানুগত্যের অভাব। তাই আমরা মানবিক গুণের অনুশীলনে-পরিশীলনে অর্জনে উদাসীন। এর ফলেই সমাজে ঘৃণা-লজ্জা-ভয়ভীরু মানুষ ক্রমেই দুর্লভ-দুর্লক্ষ্য হয়ে উঠছে, আমরা ক্রমেই জাগতিক জীবনে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে কেবলই বেচশম, বেহায়া, বেলেহাজ, বেআক্কেল, বেআদব, বেশরম, বেল্লিক, বেদানাই লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে-- দেখতে পাচ্ছি। আত্মসম্মান ও আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন বিবেকবান মানুষের সংখ্যা হ্রাস জাতির অবক্ষয়ের লক্ষণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রতি সংঘটিত সিন্ডিকেটের রূপ ও প্রকৃতি দেখে ব্রিটিশ সরকারের বিদ্যার ও সংস্কৃতির মূল্য ও মর্যাদাবোধের কথা মনে পড়ে গেল। ১৯৭৩ সনের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে অনেক ভালো ও উন্নতমানের প্রশাসনিক ব্যবস্থা রয়েছে। তবে তখন আমাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ছিল না বলে এর মধ্যে কিছু ত্রুটিও থেকে গেছে।

আহমদ শরীফ : লেখক, প্রাবন্ধিক, বুদ্ধিজীবী, সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখ 24 JUL 1994